তৃতীয় অধ্যায়

বাঙলাদেশের সমাজ
ও
লোকছড়া

তৃতীয় অধ্যায়
বাঙলাদেশের সমাজ ও লোকছড়া

বাঙ্গালীর লোকছড়ায় বাঙলার সমাজ ঃ

বিশেষ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সংস্কৃতির যে রূপায়ণ হয়, তার একটা বিশিষ্ট রীতি আছে, বিভিন্ন যুগের সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্ভব, প্রাধান্য ও প্রসার, মিলন মিশ্রন ও সংঘাত এবং গ্রহণ বর্জন ও বিলোপের রীতির মধ্যেই সংস্কৃতির ইতিহাসের সমস্ত রহস্য, রোমাঞ্চ ও বিস্ময় লুকিয়ে থাকে।

যে কোন জাতির যে কোন দেশের বা অঞ্চলের সংস্কৃতিধারার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে তিনটি বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে বিজ্ঞানীরা সাংস্কৃতিক উপাদানের স্থিতি, সৃষ্টি ও লয় বলে অভিহিত করেছেন। অতীতকালের অনেক উপাদান আমরা বংশ পরম্পরায় দীর্ঘকাল ধরে বহন করে চলি, সহজে ছাড়তে পারি না, এমন কি চেষ্টা করলেও তার প্রভাব মুক্ত হওয়া সহজ নয়, কারণ মনের অবচেতন গুহায় সেগুলি লুকিয়ে থাকে, পরিবেশ অনুকূল হলেই সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে। বাঙালিদের অভ্যাস, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, ধ্যান-ধারণা, উৎসব-পার্বণ, অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করে দেখলে অতীত সংস্কৃতির অনেক উপাদানের জীর্ণ কঙ্কালের সন্ধান পাওয়া যায়। মনে হয়, মানুষের মানসলোক একটা প্রাচীন গোরস্থানের মতো, অতীতকালের বহু ধ্যান-ধ্যারণাগুলি সেখানে মৃত প্রেতের আকারে বসবাস করছে। মানুষের এই প্রবৃত্তি বা অভ্যাসকেই সংস্কৃতি বিজ্ঞানীরা 'স্থিতি' অবস্থা বলে বর্ণনা করতে চান (Persistance)।

সংস্কৃতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো নতুনের উদ্ভাবন, আবিস্কার বা সৃষ্টি, যুগে যুগে সমাজের তাগিদে নতুন নতুন সাংস্কৃতিক উপাদান উদ্ভাবিত হয় এবং তার ঘাত-প্রতিঘাতে ধীরে ধীরে পুরাতনের ভাঙন ও নতুন ধারার গড়ন শুরু হয়। নতুন-পুরাতন উপাদানের মিলন-মিশ্রণের ভিতর দিয়ে নতুন নতুন 'কালচার-কমপ্লেক্সের' সৃষ্টি হয়। প্রচলিত সাংস্কৃতিক উপাদানের সঙ্গে যখন নতুন কোন উপাদান মিশ্রিত হয়, তখন আগের উপাদানের বিন্যাস বা সন্নিবেশ বদলে যায় তার ফলে উপাদানগত এবং সন্নিবেশগত তাৎপর্যও রূপান্তরিত হয়। সংস্কৃতিকে এই কারণে configuration বলা হয়। সাংস্কৃতিক উপাদানের এইরকম উদ্ভাবন ও বিলোপের ফলে মৌল সংস্কৃতির তাৎপর্যান্তর ঘটে। স্থান ও কালভেদে সংস্কৃতি তাই পরিবর্তনশীল। যে কারণে রীতি-নীতির তাৎপর্য গবেষণায় তাই দেখা যাবে কোনও একটি বিষয়ে মৌলিকতা বজায় রেখে স্থান অথবা জাতিভেদে সেটির ভিন্নতা প্রাপ্তি হয়েছে। সংস্কৃতির এই সচলতাকেই 'সৃষ্টি' বা Invention বলা হয়েছে।

নতুন সামাজিক পরিবেশে পুরাতন সংস্কৃতির অনেক ধ্যানধারণা বা প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তন ঘটে যায় বা লোপ পেয়ে যায়। এই লয়-শীলতা সংস্কৃতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। লক্ষণীয় হল, সৃষ্টিশীলতা ও লয়শীলতা সংস্কৃতির পরিবর্তনশীলতার পরিচায়ক, এই দুটি বৈশিষ্ট্যের সম্মিলিত শক্তি তাই তৃতীয় বৈশিষ্ট্য স্থিতিশীলতার চেয়ে অনেক বেশী প্রবল।

"সাংস্কৃতিক স্থিতির একটি বড় দিক হলো 'ট্রাডিশন' বা ঐতিহ্য। সাধারণত সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সদগুণের প্রবাহকে আশ্রয় করেই ঐতিহ্যের প্রত্যয় গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া সংস্কৃতির

ভৌগোলিক প্রবাহও আছে যাকে diffusion বলা হয়। সাংস্কৃতিক ট্রাডিশনের গতিকালকে বলে ভার্টিক্যাল এবং ডিফিউসনের গতিকালকে বলে হরাইজন্টাল। বলা যায় সংস্কৃতির গভীরতা হল ট্রাডিশন এবং প্রসারতা হল ডিফিউশন। একটির গতি কাল থেকে কালান্তরের দিকে, অন্যটির গতি দেশ থেকে দেশান্ত রের দিকে যায়। বাংলাদেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত সংস্কৃতির যে প্রবাহ, তা হল ডিফিউশনের বা প্রসারণের ব্যাপার। আর বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বণিক, গোপ, সদ্‌গোপ, মাহিষ্য, কৈবর্ত অথবা হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিবর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব কৌলিক ও সাম্প্রদায়িক সংস্কারের অস্তিত্ব দেখা যায় - সেগুলিকে ঐতিহ্যগত সংস্কার বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানীদের মতে এই সাংস্কৃতিক প্রসারণ হল inter societed gransmission of culture in space এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা gadetion কে বলেন intra societed gransmission of culture in time উদ্ভাবন যেমন সংস্কৃতির ধর্ম, প্রসারণ তেমনি সংস্কৃতির প্রাণশক্তি।"[১]

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রচলিত নিয়মগুলি যাকে কেন্দ্র করে সমাজ পরিচালিত ও আবর্তিত হয় তা ভালোই হোক অথবা মন্দ । তাই একটি সম্প্রদায় ও জাতির পরিচিতির প্রাণস্বরূপ। বাঙালিদের সমাজ কাঠামোয় যে নিয়ম বা নির্দেশগুলি কাজ করতো সেগুলি হল ঃ

১. জাতিবর্ণ / কৌলীন্য প্রথা
২. বহুবিবাহ
৩. পণপ্রথা
৪. কন্যা পণ দেওয়ার প্রথা।
৫. সতীন সমস্যা।
৬. বাল্য বিবাহ।

জাতিবর্ণ প্রথা ঃ

বাঙলাদেশের সমাজ সর্ম্পকে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় এর জাতিবর্ণ প্রথার। যে যুগে মনুস্মৃতি, মহাভারত প্রভৃতি রচিত হয়, সেই যুগেই আর্যধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করে।

জাতিভেদ আর্যসমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর্যরা বাংলাদেশে বসবাস করার ফলে এখানেও জাতিবর্ণ প্রথার প্রচলন হয়। "খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে এদেশে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। এদেশে এরূপ একটি মত প্রচলিত আছে যে বাঙলায় কলিকালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছিল না, কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণ ছিল। কিন্তু এর কোন ভিত্তি নাই। প্রাচীনকালে বাংলায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই ছিল।"[২]

জাতিবর্ণপ্রথা ভারতীয় হিন্দু সমাজের মত বাঙলাদেশের সমাজেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথা। কারণ জাতি বর্ণের নানা বিভাগ বাঙলাদেশের সমাজের গতি প্রকৃতিকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাঙলাদেশের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, সর্বভারতীয় বর্ণব্যবস্থার ধারণা শাসকদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। চতুর্বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে উচ্চাবচ স্তরবিন্যাস তথা বর্ণের অপরিবর্তনীয়তা মধ্যযুগীয় বাংলাদেশের শাসকরা প্রচার করতেন। জাতিব্যবস্থা গড়ে ওঠার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছিল শ্রমবিভাগ। শ্রমবিভাগ এক একটি বৃত্তির সঙ্গে এক একটি গোষ্ঠীর সংযোগ ইতিহাসের একটি দীর্ঘ জটিল ঘটনা। এই জাতিব্যবস্থার মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাসের বিচিত্র গতি।

জাতিবর্ণ ব্যবস্থার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম অন্তর্বিবাহ। বিবাহ ছাড়াও উচ্চবর্ণের ব্যক্তি নিম্নবর্ণের ব্যক্তির কাছ থেকে অন্নজল গ্রহণের মাধ্যমে বর্ণত্ব বা জাতিত্ব দূষিত করতে পারতেন। তাই বিবাহ বা অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াকর্ম তথা অন্নজল গ্রহণের নানা প্রকার বিধান তৈরী হয়েছিল বঙ্গীয় সমাজে। ধরে নেওয়া যায় মোটামুটিভাবে পঞ্চম শতাব্দীর পর থেকে শুরু হয় বঙ্গে ব্রাহ্মণদের আগমন। এই সময় থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি নানাপ্রকার ঘটনা বঙ্গীয় সমাজের জাতিবর্ণ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে।

"গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে বাংলাদেশে জাতিবর্ণ প্রথার চিত্র পাওয়া যায় ঐ যুগের তাম্রলিপিগুলি থেকে। তাম্রলিপিগুলির অধিকাংশ পাওয়া গিয়েছে পুন্ডবর্ধনভুক্তি বা উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে। উত্তরবঙ্গই বাঙলাদেশে জনবসতির প্রথম সাক্ষ্য বহন করছে। কোথাও ব্রাহ্মণরা নিজের উদ্যোগে ভূমি ক্রয় করছেন। কোথাও আঞ্চলিক শাসকরা বা ধনাঢ্য গৃহস্থরা ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করছেন বেদপাঠ ও পূজার্চনার দ্বারা পূণ্যলাভের আশায়। এইভাবেই শুরু হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রসার।"[৩]

ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন বর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রের উল্লেখ পাওয়া যায় না এই পর্বে। তবে ব্রাহ্মণ ছাড়া যে আরও একটি উচ্চাবচ স্তরবিন্যাস ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর তাম্রলিপিগুলি এবং রাবণচরিত কাব্য বাংলার সমাজের দ্রুত ব্রাহ্মণীকরণ বা আর্যীকরণের সাক্ষ্য বহন করে। ব্রাহ্মণীকরণ বা আর্যীকরণ বলতে বোঝায় কোন সমাজের ব্রাহ্মণ নির্দেশিত রীতি আচার-অনুষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি। তবে এই আর্যীকরণ যে খুব সহজেই ঘটত না তা বলাই বাহুল্য।

"খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেন বংশের রাজত্বকালে বাঙলাদেশে বিশেষত (পূর্ববঙ্গে) ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র দৃঢ়তর হয়। সেন রাজারা ছিলেন দাক্ষিণাত্য থেকে আগত ব্রহ্মক্ষত্রিয়।"[৪] বর্ণ হিসেবে ব্রাহ্মণ এবং বৃত্তি হিসেবে ক্ষত্রিয় এই যুক্তিতে ব্রহ্মক্ষত্রিয় শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন সেন রাজারা।

সেন বংশের রাজত্বকালে জাতিবর্ণ প্রথার আলোচনা করতে গেলে উল্লেখ করতে হয় কৌলিন্য প্রথার। সেন বংশের রাজা বল্লাল সেনের নামের সঙ্গে যুক্ত এই প্রথা; তবে সেকালের কোন লিপিতে এর উল্লেখ নেই। এই সামাজিক ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায় পরবর্তীকালে লিখিত কুলজী গ্রন্থগুলিতে। কৌলিন্য প্রথা অনুসারে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এই দুই জাতির অন্তর্ভুক্ত পরিবার বিশেষকে সমাজে উচ্চ স্থান দেওয়া হত। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে - "বঙ্গদেশে রাঢ়ীয় বংশ, উড়িষ্যার দাক্ষিণাত্য এবং মিথিলার ব্রাহ্মণদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথা একদা বহু প্রচলিত ছিল। কৌলিন্য বলতে বোঝায় গুণের ভিত্তিতে সৃষ্ট একটি কাল্পনিক উচ্চশ্রেণী। এই গুণের সংখ্যা নয়টি ঃ আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপস্যা ও দান। এই গুণগুলির ভিত্তিতে উত্তর-রাঢ়ীয় ও দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থরাও নিজেদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথা প্রচলন করে। এই প্রথা প্রবর্তনের ফলে কুলিন আখ্যায় ভূষিত ব্রাহ্মণদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায় যদিও তাদের মধ্যে আচার, বিদ্যা, বিনয় প্রভৃতি কুল লক্ষণের রীতিমত ঘাটতি ছিল।"[৫]। কৌলিন্য প্রথা অনুসারে কুলীনই একমাত্র কুলীনের ঘরের কন্যা বিবাহ করতে পারত।

কুলজি গ্রন্থের প্রমাণ অনুসারে আদিশূরই প্রথম, যিনি পাঁচজন ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ সেবক অনুসারে পাঁচজন শূদ্রকে বাংলাদেশে নিমন্ত্রণ করেন। কুলীন শূদ্রদের মধ্যে ছিলেন ঘোষ, বসু ও মিত্র। আবার আশিজন শূদ্রের একটি গোষ্ঠির মধ্যে কুলীন জনোচিত নয়টি গুণের অভাব ছিল। সেন যুগের সমাজে তারা স্থান পেলেন মৌলিক হিসাবে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে। এই আশি জনের মধ্যে কেবল দত্তকে বলা হত উত্তর ভারত থেকে আগত। অন্য ঊনআশিজন সম্পর্কে মনে করা হত যে, তারা পঞ্চ শূদ্রের বাংলায় আগমনের আগে থেকেই বাংলায় বসবাস করতেন। এই গোষ্ঠীকে ভাগ করা হত সিদ্ধ ও সাধ্য এই দুইভাগে। সিদ্ধ মৌলিক হল বাঙলাদেশের আদি-শূদ্রগোষ্ঠী থেকে আগত। সেন, দত্ত, কর, দেব, পালিত, সিংহ এবং গুহ এই মৌলিকরা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে তাদের কূলকে ঘোষ, বসু ও মিত্র পর্যয়ে উন্নীত করতে পেরেছিলেন।

পাঁচজন ব্রাহ্মণের ৫৬ জন পুত্রকে বল্লাল সেন তাঁর সভায় নিমন্ত্রণ করেন এবং প্রত্যেককে এক একটি করে গ্রাম দান করেন। গ্রামের নাম অনুসারে কূলের নামকরণ করা হয়, একেই বলা হয় গাঁঞী। কিন্তু গাঁঞীর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল ব্রাহ্মণদের আঞ্চলিক বিভাগ, বারেন্দ্র ও রাঢ়ী। বারেন্দ্র ও রাঢ়ী ব্রাহ্মণরা যথার্থ বেদবিদ না হওয়ায় প্রয়োজন হল আরও এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের এঁরা অভিহিত হলেন বৈদিক ব্রাহ্মণ হিসাবে। বারেন্দ্র ও রাঢ়ী বৈদিক ছাড়াও কুলজী গ্রন্থে ও লিপিমালায় পাওয়া যায় আরো দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের। এরা হলেন শাকদ্বীপি ও সারস্বত। "বল্লাল চরিতে যে সমুদায় আখ্যান উদ্ধৃত হয়েছে, তা থেকে মনে হয় যে রাজা মনে করলে কোন জাতিকে উন্নত অথবা অবনত করতে পারতেন। কিন্তু পাল রাজগণের লিপিতে তাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রতিপালনের উল্লেখ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাধারণত রাজগণ সমাজের বিধান সযত্নে রক্ষা করে চলতেন, বিশেষত রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে কোন গুরুতর পরিবর্তন সহজসাধ্য ছিল না।"[৬]

"সেন আমলে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে বিভিন্ন জাতির মধ্যে উন্নীত ও অবনীতকরণের যে প্রবণতা দেখা যায় তার বীজ হয়ত সেন আমলেই ছিল। সুলতানী মুঘল যুগেই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ এই তিনটি জাতির উৎকর্ষের ধারণাও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়।"[৭]

বিভিন্ন জাতির মধ্যে অন্নগ্রহণ ও বৈবাহিক সম্বন্ধ বিষয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর মত কঠোরতা প্রাচীন হিন্দুযুগে ছিল না। একজাতির মধ্যেই সাধারণত বিবাহাদি হোত, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর বর ও নিম্নশ্রেণীর কন্যার বিবাহ ও শাস্ত্রে অনুমোদিত ছিল এবং কখনও কখনও অনুষ্ঠিতও হোত।[৮]

প্রাচীন বঙ্গ সমাজে ব্রাহ্মণের পরই সম্ভবত করণ জাতির প্রাধান্য ছিল। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে সংকর জাতির মধ্যে প্রথমেই করণের উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টীয় ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৮ম শতাব্দীর তাম্র শাসনে প্রথম কায়স্থ, জ্যেষ্ঠ কায়স্থ প্রভৃতির উল্লেখ দেখে মনে হয়, তখনও বাংলায় কায়স্থ শব্দে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী মাত্র বোঝাত। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর একখানি শিলালিপিতে গৌড় কায়স্থ বংশের উল্লেখ আছে। সুতরাং এই সময়ে বাংলায় কায়স্থ জাতির উৎপত্তি হয়েছে এরকম মনে করা যেতে পারে। কুলজী গ্রন্থের মতে আদিশূর কর্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে পঞ্চ ভৃত্য এসেছিল, তারাই ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত প্রভৃতি কুলীন কায়স্থের আদি পুরুষ। এছাড়া ছিল বৈদ্য জাতি, ঠিক কোন সময়ে বাঙলাদেশে এই জাতির প্রতিষ্ঠা হয় তা বলা কঠিন। তবে এরা রাজ্যে ও সমাজে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং তাদের কেউ কেউ ব্রাহ্মণ বলে বিবেচিত হতেন।"[৯]

বাঙলাদেশে জাতিভেদ প্রথার এই কঠোরতার কারণে বিবাহ বিষয়টিও একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রথায় পরিণত হয়েছিল। "হিন্দু সমাজের বিবাহ প্রথার মূল উদ্দেশ্য সমাজ রক্ষা। কোন কন্যার কোন বর আবশ্যক তা প্রাচীন শাস্ত্রকাররা বিচার করিয়া গিয়াছেন। পুরুষ ও নারী পরীক্ষার উদ্দেশ্যও তাই ছিল। বিবাহ জ্যোতিষীর দ্বারা গণনার প্রয়োজনও এই কারণে হয়েছিল। এই গণনা দ্বারা কেবল ভবিষ্যত নহে, বর-কন্যার অতীত অবস্থা জানিয়া পরবর্তী দাম্পত্য দশার অনুমানের চেষ্টা হইত। ঘটক অজ্ঞাতকুলশীল বরের কীর্তিকাহিনি বর্ণনা করত। বিবাহে যে অশেষ বিষয়ে সাবধান হতে হয়, তা আমাদের সমাজ যত উপলব্ধি করেছিল, বোধ হয় অন্য কোন সমাজ এত করে নি। এই কারণেই কুলীনের কুলমর্যাদা এবং কন্যাকে যৌতুক দানের ব্যবস্থা হয়েছিল।"[১০] কিন্তু কুলীন প্রথার খারাপ দিকগুলি সমাজের অনেক অহিত সাধনে সাহায্যকারী হয়েছিল, যার প্রতিফলন ঘটেছিল বাংলা লোকছড়াগুলিতে।

কৌলিন্য প্রথা ঃ

কৌলিন্য প্রথার কারণে এক শ্রেণীর মানুষ বিশেষ সুবিধার জায়গায় ছিলেন বলে এই প্রথাটিকে তারা বহু যত্নে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু এই প্রথা পুরুষের সুবিধার কারণ হলেও নারীর পক্ষে তা ছিল সার্বিক অসহায় অবস্থা। "বাংলাদেশে প্রবাদ এই বল্লাল সেন আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি নয়টি গুণ থাকার জন্য যে সকল ব্রাহ্মণকে কৌলিন্য মর্যাদা দেন তাদের সংখ্যা কুড়ির বেশী ছিল না। সমস্ত কুলীনই এক পর্যায়ভুক্ত ছিলেন এবং অকুলীনের কন্যা বিবাহ করিতেও তাহাদের কোন বাধা ছিল না। বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষণ সেনের সময়ে একটি গুরুতর পরিবর্তন হইল। প্রথম প্রথম গুণানুসারে মাঝে মাঝে নতুন নতুন ব্যক্তিকে কুলীনের মর্যাদা দেওয়া হইত। লক্ষণ সেন কুলীনের বৈবাহিক সম্বন্ধের বিষয়ে অনেক নিয়ম করিলেন এবং এই নিয়ম কাহারা কতদূর অনুসরণ করিয়াছে তাহার বিচার করিয়া কুলীনদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাদের অনেকেরই পূর্বোক্ত নয়গুণ তো দূরের কথা, তাহার একটিও ছিল কিনা সন্দেহ। বরং ক্রমে ক্রমে কুলীনদের মধ্যে নানা দোষ ঘটিতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে এক একটি মেলের মধ্যে লোকসংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় আঠারো ও উনিশ শতকে ইহার ফল হইল বিষময়।"[১১]

"মধ্যযুগের সমাজে কৌলিন্যপ্রথা এনেছিল এক অসামান্য জটিলতা। যে প্রথার বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল বাঙলা ও মিথিলাতে। কৌলিন্য প্রথা সম্বন্ধে যে মতটা আজ সমীচীন বলে গৃহীত হয়েছে সেটা হচ্ছে যে, পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙালি কুলপঞ্জীকাকার এটা প্রথম ব্রাহ্মণ সমাজে কায়েম করার চেষ্টা করেছিলেন এবং এটাকে একটা রীতিমতো স্বীকৃতি দেবার জন্যই তারা এর সঙ্গে বল্লাল সেনের নাম জড়িত করেছিলেন। ব্রাহ্মণ সমাজের অনুকরণে এই পদ্ধতিক্রমে কায়স্থ, বৈদ্য, সদ্‌গোপ প্রভৃতি সমাজে প্রবর্তিত হয়েছিল, বস্তুত বৈদ্যসমাজে কৌলিন্যপ্রথা যে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রবর্তিত হয়েছিল তার প্রমাণ আছে।"[১২]

কৌলিন্য প্রথার ফলে নিজ জাতির মধ্যেই পরস্পরের আচার ও বৈবাহিক বিষয়ে নানারকম জটিল রাজনীতি ও রীতি পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল সমজাতীয় সমাজে বিভিন্ন বংশকে উচ্চ ও নীচ রূপে চিহ্নিত করে। এই প্রথা যে সমাজকে দুর্বল করে দিয়েছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।"[১৩]

ব্রাহ্মণ সমাজে এই প্রথাটি ছিল কন্যাগত। অর্থাৎ কুলীনের ছেলে কুলীন ছাড়া অকুলীনের মেয়েকেও বিবাহ করতে পারত। কিন্তু কুলীনের মেয়ের বিবাহ কুলীনের ছেলের সঙ্গেই দিতে হোত। অকুলীনের সঙ্গে বিবাহ দিলে মেয়ের বাপের কৌলিন্য ভঙ্গ হোত এবং সমাজে তাকে হীন বলে মনে করা হতো। এর ফলে মেয়েদের বিবাহ কখনও হোত অত্যন্ত বাল্যবয়সে আবার বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেলেও উপযুক্ত পণের খরচ জুগিয়ে মেয়ের বিবাহ দেওয়া সম্ভবপর হতো না। ভারতচন্দ্র তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্যে লিখেছেন -

আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে,
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে ॥
যদি বা হইল বিয়া কতদিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড়দিদি হই ॥
বিয়াকালে পন্ডিতে পন্ডিতে বাদ লাগে।
পুনর্বিয়া হবে কিনা বিয়া হবে আগে ॥
বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘটি বাটি।
জাতির যেমন হৌক কুলে বড় আঁটি ॥

দু চারি বৎসরের যদি আসে একবার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার ॥
সুতা বেচে কড়ি যদি দিতে পারি তায়।
তবে মিষ্টি মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায় ॥

বাংলা সাহিত্যের লোকপ্রচলিত ছড়াগলিও কুলীন প্রথার পক্ষে যথেষ্ট জোড়ালো সাক্ষ্য বহন করে। যেমন -

১। তালগাছ কাট্‌ম বোসের বাট্‌ম
গৌরী এল ঝি।
তোর কপালে বুড়ো বর
আমি করব কি।।
টঙ্কা ভেঙ্গে শঙ্খা দিলাম
কানে মদন কড়ি।
বিয়ের বেলা দেখে এলুম
বুড়োর চাপদাড়ি।।
চোখ খাও গো বাপ মা
চোখ খাও গো বুড়ো।
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে
তামাক খেকো বুড়ো।।
বুড়োর হুঁকো গেল ভেসে
বুড়ো মরে কেশে।
নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো
মরে রয়েছে।
ফেন গালবার সময় বুড়ো
নেচে উঠেছে।। (রবীন্দ্র সংগ্রহ)

২। ডালিম গাছে পরভু নাচে (পরভু -প্রভু)
তাক ধুমাধুম বাদ্যি বাজে।।
আই গো, চিনতে পারো,
গোটা দুই অন্ন বাড়ো
অন্নপূর্ণা দুধের সর।
কাল যাবো গো পরের ঘর।।
পরের ব্যাটা মারলে চড়
কানতে কানতে খুড়োর ঘর।
খুড়ো দিলে বুড়ো বর।
হেই খুড়ো তোর পায়ে ধরি।
থুয়ে আয় গো মায়ের বাড়ি।।
মায়ে দিল সাদা শাখা, বাপে দিল শাড়ি,
ভাই দিল হুড়কো ঠেঙা-চল শ্বশুর বাড়ি।।

৩। কালো কালো ফিঙ্গে, কালো মাথার কেশ।
উড়ে উড়ে যাওরে ফিঙ্গে কনের মায়ের দেশ।।
কনের মাকে বলো গিয়ে ভালো কিনতে বাটা।
তাহার জামাতা যাচ্ছেন কুলীনেরই ব্যাটা।।[১৪]

৪। শাগ তুলছি লতা পাতা
শেমল তলার বাড়িতে
কি দেইখে মা বিহা দিলি
ঠেঙ্গা ধরা বুড়োকে।[১৫]

বহু বিবাহ ঃ

বল্লাল সেন প্রবর্তিত এই নিয়মের ফলে বলাই বাহুল্য বাংলাদেশে কুলীন পাত্ররা বিশেষ সুবিধার অধিকারী হলেন। নারীদের অবস্থা হল শোচনীয়। একদিকে উপযুক্ত পাত্র মিলত না, ফলে কন্যাকে আজীবন কুমারী থাকতে হোত, অন্যদিকে পুরুষ একাধিক বিবাহ করত। বহু কুমারী মেয়ের বিবাহ হোত না, যাদের বিবাহ হোত তারা প্রায় সারাজীবন পিতৃগৃহেই থাকত, স্বামীর সঙ্গে কদাচিৎ দেখা হোত কারণ অনেক কুলীনের ৫০, ৬০ বা তার চেয়েও বেশী স্ত্রী থাকত। সুতরাং এদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন তার গৃহে স্থান পেত। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের পেশাই ছিল বিবাহ করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। তারা ঘুরে ঘুরে বিবাহ করতেন - প্রতি বিবাহের ফলেই কিছু অর্থ পাওয়া যেত। "কখনও কখনও একই পরিবারের একাধিক অনুঢ়া কন্যা এক সঙ্গে একই বরের হস্তে সম্প্রদান করা হইত।"[১৬] তখনকার দিনে বিশ্বাস ছিল অনুঢ়া স্ত্রীলোক মৃত্যুর পরে স্বর্গে যেতে পারে না, সুতরাং মৃত্যুপথযাত্রীর সঙ্গে একদল বালিকা যুবতী বৃদ্ধার বিবাহ দিয়ে তাদের কুমারীত্ব ঘুচিয়ে স্বর্গের পথ মুক্ত করা হোত।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন - "প্রথাবদ্ধভাবে পবিত্র বিবাহ পদ্ধতির এরূপ অবমাননা এবং স্ত্রীর প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধার চিত্র বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও দেখা যায় না। ফলে কুলীন ব্রাহ্মণের পরিবার নানারকম ব্যাভিচারের ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল আর হিন্দু সমাজ সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও যে শতাব্দীর পর শতাব্দী এই ব্যবস্থা মানিয়া চলিয়াছিল ইহা হিন্দু অধঃপতনের একটি চরম নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।"[১৭]

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর তার অন্নদামঙ্গলে লিখেছেন অনুরূপ কথা। ভবানন্দ মজুমদার দিল্লী থেকে বাড়ি এসে চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী দুই পত্নী নিয়ে বিশেষ বিপদে পড়লেন -

শুনি মজুমদার বড় উন্মনা হইল।
কার ঘরে আগে যাব ভাবিতে লাগিল।।
যাইতে ছোটর ঘরে বড় মনোরথ।
বড় কিলা বাদ হাটা আগুলিয়া পথ।।
এক চক্ষু কাতরায়ে ছোট ঘরে যায়।
আর চক্ষু রাঙা হয়ে বড় মনে ভয়।।

"আঠারো শতকে শুকুর মামুদ বা মোহাম্মদ রচিত গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস - এই কাহিনীতে আছে রাজা তার পুত্র গোপীচন্দ্রকে পর পর তিনটি বিয়ে দেন, তৃতীয় বিয়ের সময় গোপীচন্দ্র স্ত্রী অদুনার সঙ্গে যৌতুকস্বরূপ লাভ করেন তার বোন পদুনাকে। "তিন বিভা করিল রাজা পাইল চারি

রানী।" সমাজে বহু বিবাহ ও যৌতুক হিসাবে নারী, এমন কি শ্যালিকা পাবার প্রথা চালুর তথ্য এ থেকেই পাওয়া যায়।[১৮]

কুলীন ব্রাহ্মণদের অগুণতি বিবাহের ফলে এবং বিবাহিত পত্নীকে পিত্রালয়ে ফেলে যাওয়ার ফলে কুলীন কন্যাগণ যে সব ক্ষেত্রেই সতী সাবিত্রীর জীবন যাপন করত সে কথা হলপ করে বলা যায় না। তৎকালীন সময় লিখিত নাটকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। উমেশচন্দ্র মিত্র বিধবা বিবাহ নাটকে লিখেছেন -

আমরা কুলীন ঘরে জন্মিয়াছি বটে
তবু তো এমন বুদ্ধি নাহি আসে ঘটে
ঘরে বসে কি না করি কে দেখে কাহারে
গঙ্গা জলে ধোয়া মোছা মেয়ে আছে কার ঘরে ॥
ছ'মাস ন'মাস অন্তে কান্তে দেখা পাই।
উপলক্ষ আছে বলে ধর্ম রক্ষা তাই ॥
বিপদে পড়িলে ঘরে আসেন জামাই।
যেখানে যা করি দেই তাহারি দোহাই ॥
বুঝিবার ভুলে যদি বাড়াবাড়ি হয়।
অমুক যে ভাল নয় এইমাত্র কয় ॥ (পৃঃ ৬৫)

বাংলার লোকছড়াগুলিতেও সমাজের এই অবস্থার কথাই ধরা পড়েছে।

১। এক যে ছিল বনলতা
বলি তার প্রেমের কথা ॥
ভাতার ধরলি মাথা ব্যথা
সে ধরলি হাসির কথা।
ভাতার ছেড়ে তাই ধরেছে
কি কব তার কথা।
প্রেম করিল বনলতা ॥ (যশোহর)[১৯]

২। বড়ো বউ গো ছোট বউ গো
জলকে যাবি গো
জলের মধ্যে ফুল ফুটেছে
দেখতে যাবি গো।
কেষ্ট বেড়াল কুলে কুলে
তাঁত নিবি গো ॥
তারি জন্য মার খেয়েছি
পিঠ দেখো গো।
বড় বউ গো ছোট বউ গো
আরেক কথা শুন্‌সে
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে
চূঁড়ো বাঁধা মিন্‌সে ॥

ঘটি নেয়না বাটি নেয়না
নেয় না সোনার ঝারি
যে ঘরেতে রাঙা বউ সেই ঘরেতে চুরি ॥
(রবীন্দ্র সংগ্রহ)[২০]

৩। মিটমিটে বাতি আর পিট্‌পিটে ভাতার,
কোনদিকে যাব গো দুদিকেই আঁধার।[২১]

৪। আশ করলাম বাস করলাম
কাপড় দিলাম ধুইতে,
নাঙ্গের চালে ছাই পড়ল
ভাতার আইল নিতে। (রাজশাহী)
(নাঙ্গের (লাঙ্গের) - নগ্ন, উপপতি)

৫। ভাত রানতি, কাঠ আনতি
বাগানে গেল বউ।
পিরীত করে চলে গেল
দেখলাম নাত কেউ।[২২]

উনিশ শতকে ইংরাজী শিক্ষার ফলে বাংলাদেশে বহু বিবাহের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন হয়। এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বর্ধমানের মহারাজা এবং পূর্ববঙ্গের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ ও প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোক হলেও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন । এই উদ্দেশ্যে তিনি নানা স্থানে বক্তৃতা দেন, গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অনেক ছড়া গানও এইসময় রচিত হয়। এইরকম একটি ছড়া হল -

কেম্বলকে মা মহারাণী কর নিয়োজন।
(রাজা) বল্লালেরি চেলাদলে করিতে দমন,
কাজ নাই সিক্ - সিফহিগন, চাইনা গোলা বরিষণ
(একটু) আইন অসি খরষান করগো অর্পণ,
বিদ্যাসাগর সেনাপতি
(মোদের) রাসবিহারী হবে রথী,
মোরা কুলীন যুবতী সেনা হব যে এখন।"[২৩]

পণপ্রথা ঃ

"প্রাচীন বিশেষত মধ্যযুগের কুলীন প্রথার অন্যতম অন্ধকারময় দিকটি হল পণ বা যৌতুক প্রথা। প্রাচীন সংস্কৃতির প্রমাণ অনুসারে জীমূতবাহন আধিবেদনিক নামক একপ্রকার স্ত্রীধনের ব্যবস্থা করেছিলেন। পতি অপর পত্নী গ্রহণ করলে পূর্ব পত্নীকে যে অর্থাদি অবশ্য দান করবেন তার নাম আধিবেদনিক। জীমূতবাহনের পরবর্ত্তী কোন বাঙালি স্মৃতি নিবন্ধকার এই প্রকার স্ত্রীধনের উল্লেখ করেন নি। অধিকাংশ বাঙালি নিবন্ধকার বল্লাল সেনের (খৃঃ ১২শ শতক) পরবর্তী। বল্লাল প্রবর্তিত কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তনের ফলে সমাজে কুলীনগণ যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তার জন্য একজন কুলীননন্দন অপদার্থ হলেও বহু স্ত্রী বিবাহ করতেন। বহু বিবাহ এত ব্যাপক হয়ে পড়েছিল

বলেই বোধ হয় 'আধিবেদনিক' এর প্রচলন লুপ্ত হয়েছিল এবং নিবন্ধকারগণও এর বিধান দেন নি।[২৪]

শাস্ত্রে উল্লেখ থাকার কারণে এবং বাংলাদেশে কৌলিন্যপ্রথার ব্যাপক প্রচলনের কারণে 'আধিবেদনিক' নামক এই স্ত্রীধনটির একটি বিকৃত ব্যবহার ব্যাপক হারে দেখা গেল বাংলাদেশের প্রতি ঘরে। কন্যা কুলীন হলে তো কথাই নেই, অকুলীন কন্যার বিবাহও বিনা পণে অসম্ভব হয়ে উঠল। কন্যাপণের হাত থেকে উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত কারোরই রেহাই মিলল না। কৌলিন্য প্রথার কারণে মেয়ের বিবাহ কষ্টকর ও ব্যয় সাপেক্ষ হয়ে ওঠায় সংসারে মেয়েকে অপসারণ করবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পিতা-মাতার মধ্যে ছিল। সেজন্য গঙ্গাসাগরের মেলায় গঙ্গার জলে কন্যাসন্তান বিসর্জন অথবা মন্দির দ্বারে কন্যাত্যাগ এইসব জঘন্য প্রথাগুলি সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে গিয়েছিল।

সোমপ্রকাশ পত্রিকায় ১২৭১ সালের ১০ই বৈশাখ সংখ্যায় কন্যাদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে - "কন্যা জন্মিলেই সর্বনাশ, বরের অথবা পিতামাতার অসঙ্গত অর্থলোভই এই বিপত্তির কারণ। অনেক স্থলে এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, পরিণয় সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে বরের পিতামাতা কন্যার পিতামাতার নিকট অসঙ্গত অর্থ প্রার্থনা করেন। উচ্চঘরে কন্যা সম্প্রদান না করিলে কুলক্ষয় হইবে এই শঙ্কায় কন্যার পিতামাতাকে সর্বস্ব বিক্রয় করিয়াও অগত্যা সেই প্রার্থনা পরিপূরণ করিতে হয়। এই কুৎসিত রীতি নিবন্ধন ফলে অযোধ্যায় কন্যা হত্যা প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল। কন্যা জীবিত থাকিলে সম্প্রদানকালে আপনাদিগকে দরিদ্র হইতে হইবে, এই ভয়ে মাতাপিতা কন্যার স্নেহ বন্ধন ছিন্ন করিয়াও তাহার প্রাণবধ করিত। উহা প্রথারূপে পরিণত হইল।"[২৫]

"বঙ্গদেশে কন্যাহত্যা প্রথা নাই, কিন্তু বিবাহকালে কন্যার মাতাপিতাকে বরের মাতাপিতার যেরূপ অসঙ্গত অর্থলাভ তৃষ্ণা চরিতার্থ করিতে হয়, তাহাতে অনেকে এককালে দরিদ্র হইয়া পড়েন, কলিকাতায় সুবর্ণ বণিকদের মধ্যে যিনি দরিদ্র বলে পরিগণিত, তিনিও ৫০ ভরি সুবর্ণের ন্যূনে কন্যা সম্প্রদানকালে অব্যহতি পান না। কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের প্রতিজ্ঞা পূর্বক অর্থগ্রহণ প্রবাদ চিরপ্রসিদ্ধি আছে, এই সকল কারণে কন্যার পিতামাতা আপনাদিগকে কন্যাদায়গ্রস্থ বিবেচনা করেন। এই কুৎসিত প্রথা যে পূর্বে ছিল না তাহা ধর্মশাস্ত্রকার দিগের বচন দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে। [২৬]

অভিশপ্ত এই পণ-প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিকারের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ঘৃণ্য এই প্রথার পরিণতিতে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাকে হতে হোত সর্বস্বান্ত। বিষময় সেই পরিণতি কন্যার প্রতি স্নেহের শিশির চিহ্নটুকুও শুকিয়ে দিত গোড়া থেকে। তারই প্রতিছবি এই ছড়াগুলিতে -

১। জোড় গাছের তলে সোনার প্রদীপ জ্বলে।
তারি তলে বাবা আমার কন্যা দান করে।।
জোড় গাছের তলে সোনার প্রদীপ জ্বলে।
তারি তলে বাবা আমার থালা দান করে।।
সেও থালা কানা বাবা, লোকে নিন্দা করে।
জোড় গাছের তলে সোনার প্রদীপ জ্বলে।।
তারি তলে কাকা আমার গেলাস দান করে।
সেও গেলাস কানা কাকা লোকে নিন্দা করে।।
জোড় গাছের তলে সোনার প্রদীপ জ্বলে।
তারি তলে মামা আমার কলসী দান করে।।
সেও কলসী কানা মামা লোকে নিন্দা করে।[২৭]

২। বিটির বিয়ায় উলু দিয়া গিন্নি বাজায় শাখ।
কত্তা অম্‌নি ব্যাজার মুখে বলে থাক থাক।।
কীসের আমোদ গিন্নি তুমার সর্বনাশ যে হ(ই)ল,
বর পণের কড়ি গু(ই)নতে ভিটেমাটি গেল।
বিটির মা কয়না কথা, খিদা লাগে যত
আঁচল পা(ই) তে শূয়্যে থাকে আধমরার মতো।।

৩। বিটির মা কাঁদ কেনে লাছদুয়ারে র(ই)সে ।[২৮]
শ্বশুর ঘর যাবেক বিটি চোখের জলে ভ(ই)সে।।
বিটির বাপ কাঁদ কেনে গামছা চোখে বাঁ(ই)ধে।
তুমি যে গো রেহাই পাইলে ক(ই)ন্যা দায় থা(ই)ক্যে।।

৪। লাল বৈঠা ঝানুর ঝুনুর কন্যার মাগো;
গাঙ্গের ঘাটে দামান্দ আইছে বারই চাওগো।
লাল বৈঠা ঝুনুর ঝানুর কন্যার মাগো;
দামোদর গাইয়া মানুষ আইছইন বারই চাও গো।
লাল বৈঠা ঝানুর ঝুনুর কন্যার মা গো;
ঝিয়াইয়ে সাজাইয়া দাও জলদি কর গো,
লাল বৈঠা ঝানুর ঝুনুর কন্যার মা গো
ঝিয়াই যাইন সোয়ামীর ঘর,
কান্দ কেনে গো ? (সিলেট)[২৯]

কন্যাপণ দেওয়ার প্রথা ঃ

কন্যাপণ দিয়ে বিবাহ যেমন সমাজের একটি অন্ধকারময় দিক তার চাইতেও বোধ হয় অন্ধকারাছন্ন দিক হলো কন্যাপণ নিয়ে কন্যাদান করা। কন্যাপণ নিয়ে কন্যাদান করার পিছনে আছে বাঙলাদেশের সার্বিক দারিদ্রের এক নিষ্করুণ ইতিহাস।

১৭৬৫ খৃঃ ১২ই আগষ্ট দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমের কাছ থেকে কোম্পানি বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানি সনদ লাভ করল। এর ফলে সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা এল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ইংরেজদের হাতে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায় ও মুনাফা লাভ করার যে সার্বিক শোষণ যজ্ঞের আয়োজন তাঁরা করেছিল তার ফলে ১৭৭০ খৃঃ (বাংলা ১১৭৩ সনে) বাংলা ও বিহারের বুকে এক অশ্রুত পূর্ব দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে এল। অনাবৃষ্টি একটি অন্যতম কারণ হলেও ইংরেজ বণিকদের সুষ্ঠ এই 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে' বাঙলাদেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষ মৃত্যুর শিকারে পরিণত হল। সেই সময় বাঙলাদেশে প্রচলিত একটি ছড়ায় জানা যায় -

একচেটে ব্যবসা দাম খরতর,
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হ'ল ভয়ঙ্কর।।
পতিপত্নী পুত্র ছাড়ে পেটের লাগিয়ে।
মরে লোক, অনাহারে অখাদ্য খাইয়ে।।[৩০]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন ও কৃষি শিল্পের ধ্বংস সাধনের ফলে মানুষ বিক্রি করা প্রায় স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দারিদ্রের চাপে মানুষ নিজের ছেলেমেয়ে, এমন কি স্ত্রী

পর্যন্ত বণিকদের কাছে বিক্রি করে দিত। মানুষ বিশেষ করে মেয়েমানুষ কেনাবেচার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে 'সমাচার দর্পণ পত্রিকায়'। কন্যা বিক্রয় - বর্ধমানের এক দরিদ্র বৈষ্ণব 'শ্রীযুক্ত রাজা কিষণচাঁদ রায় বাহাদুরের নিকট যাইয়া ঐ কন্যাকে (১৫০) দেড় শত টাকায় আপন স্বেচ্ছাপূর্বক বিক্রয় করিয়া প্রস্থান করিয়াছে' (১৮ জুন, ১৮২৫)।

১১ই অক্টোবর, ১৮২৮। ভার্যা বিক্রয় - শ্রী আনন্দ চন্দ্র নন্দর প্রমুখাৎ আমরা অবগত হইলাম যে, জিলা বর্ধমানের মধ্যে এক ব্যক্তি কলু অনেক দিবসাবধি বাস করিত সম্প্রতি বর্ধমানের বৎসরে তণ্ডুলের মূল্য বৃদ্ধি দেখিয়া মনে মনে মন্ত্রণা করিয়া আপন স্ত্রীকে বিক্রয় করিবার কারণে তত্রস্থ কোন স্থানে লইয়া গেল, তাহাতে তত্রস্থ এক ব্যক্তি আসিয়া এক টাকাতে তাহাতে ক্রয় করিল। ঐ স্ত্রী দর্শনে কুরূপা নহে তাহার বয়ঃক্রম অনুমান বিংশতি বৎসর হইবে, যাহা হউক সেই কলুরপো এক টাকা পাইয়া ভার্য্যা দিয়া অনায়াসে গৃহে প্রস্থান করিল।

১৬৬৩/৬৪ খৃঃ ঢাকার অস্থায়ী সুবাদার দায়ুদ খাঁর সময়ে ঢাকাতে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ১৬৬৫ খৃঃ শায়েস্তা খাঁর শাসন সময়েও তাঁর জের মেটে নি। এই দুর্ভিক্ষে এই জেলার বহু লোক অন্নাভাবে স্ত্রী-পুত্র বিক্রয় ও আত্মবিক্রয় করে উদর পালনের চেষ্টা করেছে। কন্যা বেচাকেনার ব্যবসা যদিও এই দুর্ভিক্ষের সময় বাড়ত। যেমন "কুঞ্জমালার আত্মবিক্রয় দলিল থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ...মাত্র তিনটি টাকার বিনিময়ে কন্যাসহ সে নিজেকে বিক্রি করেছিল।"[৩১]

সাধারণ সময়ে এই দরটা ছিল বেশ অনেকটাই বেশী। একটু বয়সে বড় সুন্দরীর দাম ছিল পয়তাল্লিশ টাকা, এই দাম দেড়শ টাকা পর্যন্তও পাওয়া যেত। অন্যদিকে গৌরবর্ণ ৩০ বছরের দাসীর দাম ছিল ৪ টাকা। ৮ বছরের একটি কালো মেয়ে ১ টাকা। চোদ্দ শতকে ইবন বতুতা এদেশে এসেছিলেন, তিনি ১৫ টাকায় একটি সুন্দরী কিনে স্বদেশে নিয়ে যান। ষোড়শ শতকে পর্তুগীজ দস্যুরা দক্ষিণ বাংলায় ব্যাপক লুটপাট চালাত। হাজার হাজার অল্পবয়সী মেয়ে চুরি করে বিদেশের বাজারে বিক্রি করত তারা। দেশীয়দের যোগ ছিল এ জাতীয় ব্যবসায়।"[৩২]

লোভনীয় এই ব্যবসার আওতা থেকে বাদ যেতেন না কন্যার পিতা পরিজনরা। কখনও সেই দায় হতো কৌলিন্য রক্ষা করা, কখনও একাধিক কন্যার বিবাহের কারণে ঋণভার মুক্ত হওয়া, কখনও তা হোত পরিজন অথবা সৎ পিতা-মাতার বাৎসল্যজনিত স্নেহের অভাব। কারণ যাই হোক কন্যাপণ নিয়ে কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার অর্থ একটাই ছিল তা হল কন্যাকে বেচে দেওয়া যা সেই সময়ে ছিল আত্মহত্যার প্ররোচনারই সামিল। বাংলার লোক ছড়ায় এই অভিব্যক্তি -

১। এত টাকা নিলে বাবা ছাদ্‌না তলায় বসে।
এখন কেন কাঁদছ বাবা গামছা মুখে দিয়ে।।
আমরা যাব পরের ঘর পরের অধীন হয়ে।
পরের বেটা মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে।।
দুই চক্ষের জল পড়বে বসুধরা দিয়ে।।[৩৩]

২। আলতা নুড়ি,গাছের গুঁড়ি, জোড় পুতুলের বিয়ে।
কত টাকা নিলে বাবা, দূরে দিলে বিয়ে।
এখন কেন কাঁদছ বাবা, গামছা মুড়ি দিয়ে ?
আগে কাঁদে মা-বাবা, পিছে কাঁদে পর,
পাড়া-পড়শী নিয়ে গেল দূর শ্বশুরের ঘর।
শ্বশুরের ঘর খানি বেতের ছাউনি,

তাতে বসে পান খায় দুগ্‌গা ভবানী।
হেঁই দুগ্‌গা, হেঁই দুগ্‌গা, তোমার মেয়ের বিয়ে,
তোমার মেয়ের বিয়ে দিও ফুলের মালা দিয়ে।
ফুলের মালা, রূপের ডালা, কোন সোহাগীর মউ,
হীরে দাদার মড়মড়ে থান, ঠাকুর দাদার বউ।
এক বাড়িতে খাসা দই, এক বাড়িতে চিঁড়ে,
দিব্বি করে ভোজন কর, গোরখনাথের কিরে।[৩৪]

৩। দশ কুড়ি নাড়ি ভুঁড়ি,
চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি।
আম তলায় ঝামুর ঝুমুর, কলাতলায় বিয়ে,
ঐ আসছে খেঁদির বর, গামছা মাথায় দিয়ে।
ঐ গামছা নেব না,
খেঁদির বিয়ে দেব না,
খেঁদিকে দেব সাজিয়ে
টাকা নেব বাজিয়ে।। (বাঁকুড়া)[৩৫]

৪। সানাই বাজে জোড়া জোড়া, করতাল বাজে রৈয়া।
মা বাপের কি ধন খাইলাম, দূরে ন দ্য বিয়া।।
দূরে ন দ্য, দূরে ন দ্য, গাইললের ভাগী হৈবা
কাছে ন দ্য, কাছে ন দ্য চুলাচুলি হৈবা।
মধ্যে দিও মধ্যে দিও, দিনের সম্পদ লৈবা।।
ছিক্কা ভরি লৈতে টাকা গায়ে কৈল্ল বল।
ডুলি ভরি দিতে কন্যার চক্ষের পড়ে জল।।[৩৬]

কন্যাপণ দেওয়ার দর যে কখনও কখনও হাজার টাকা পর্যন্ত উঠত অবিশ্বাস্য হলেও ছড়ায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় - হাজার টাকার বউ এনেছি খ্যাঁদা নাকের চূড়ো ইত্যাদিতে।

সতীন সমস্যা ঃ

কুলীন প্রথা তথা বহু বিবাহের একটি অনিবার্য পরিণতি ছিল সতীন-সমস্যা। কুলীন ব্রাহ্মণেরা কৌলিন্যের জোরে বেশিরভাগ সময়ই অগুনতি বিবাহ করতেন এবং ভরণ-পোষণের দায় এড়াবার জন্য বেশীরভাগ সময় স্ত্রীকে পিত্রালয়ে রেখে দিতেন। স্বামীসঙ্গ বিচ্যুত এইসব কন্যারা যে বিশুদ্ধ জীবন যাপন করতেন না, বা যাপন করতে পারতেন না তা বলাই বাহুল্য। এই ব্যবস্থা সেইসব কুলীন কন্যাদের জন্য ছিল যারা কন্যাপণের টাকা অথবা অন্য কোন কারণে স্বামীর ঘরে প্রবেশের অনুমতি পেতেন না, গ্রাম্য সমাজও এর জন্য অনেক সময় দায়ী থাকত। তারা কন্যার পরিবার অথবা পিতার কোন দোষ-ত্রুটি বের করে জনসমক্ষে নিয়ে আসত, তা বেশির ভাগই হোত জাতি দোষ সংক্রান্ত অথবা অর্থ সংক্রান্ত, চারিত্রিক দোষের হাত থেকেও রেহাই পেত না এই সব ভাগ্যহীনারা।

অন্যদিকে সেইসব পরিবারগুলি নিজেদের ভাগ্যবান মনে করত যারা কন্যাকে স্বামীর ঘরে পাঠাতে পারত। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে মেয়েটির জন্য অপেক্ষা করে থাকত হৃদয়হীন স্বামী এবং

তার একাধিক বিবাহিত স্ত্রী, বঞ্চনার শিকার যারা প্রত্যেকেই। না পাওয়ার বেদনা এদের প্রত্যেককে করে তুলতো নিষ্করুণ। সতীন মৃত্যু বা সতীনের অকল্যাণ কামনা করা তাই বাঙলাদেশের সমাজের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। বাংলা লোকছড়ায় সতীনকে নিয়ে অনেক ছড়া প্রচলিত ছিল। যেমন -

১। আম তলায় বসত করি
সতীন কেটে আলতা পড়ি।।
সাত সতীনের সাত কৌটো।
তারি মাঝে আমার এক অভ্রের কৌটো।।
অভ্রের কৌটো নাড়ি চাড়ি।
সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি।।[৩৭]

২। সতীন সতীন ফুলের মালা
সতীন হলি বড় জ্বালা
সতীন গেল শাক তুলতি
সাপে দেল পা
সত্যপীড়ের সাপ হইস তো
সতীন ধরে খা। (খুলনা)[৩৮]

পশ্চিম রাঢ়ভূমির কিছু ছড়াতেও সতীন সংক্রান্ত নারী মনস্বত্ব নিপুণভাবে ধরা পড়েছে। -

৩। একশো টাকার ছুলা ভিজ্যা ।
সড়প ধারে ছড়্যাব
সতীন মাগীর দেখা পালে
গড়াই বুক ফাটাব।

৪। বাড়ি গা ময় নিম গাছ টি
নিম ঝুর ঝুর করে
সাত-সতীনের বেটি
লিত-লিয়াই করে।[৩৯]
(লিত - রোজ)[৪০]

সতীনদের মধ্যে কখনও কখনও সুসম্পর্কও গড়ে উঠত।

৫। বারই বারই সূতা কাট,
কহিল বিহানে গোদার হাট।
গোদায় গেছে হাটে।
গোদী বইছে খাটে।
সকলে আনছে রুই কাতলা
গোদায় আনছে ইচা।(কুচো চিংড়ি)
দুই সতীনে সল্লা কইর‍্যা
গোদারে মারে পিছা।। (ঢাকা)[৪১]

৬। এতো বড়ো রঙ্গ জাদু, এতো বড় রঙ্গ,
চার তিতো দেখাতে পার, যাব তোমার সঙ্গ।।
নিম-তিতো, নিসিন্দে-তিতো, তিতো মাকাল-ফল
তাহার অধিক তিতো কন্যে বোন সতীনের ঘর।

৭। অশথ কেটে বসত করি
সতীন কেটে আলতা পরি।

৮। আন সতীনে নাড়ে চাড়ে
বোন সতীনে পুড়িয়ে মারে।

বাল্য বিবাহ ঃ

বহুবিবাহ ও পণপ্রথা ছাড়া বাঙলা সমাজ ও স্ত্রীজাতির অধঃপতনের আরও একটি অন্যতম কারণ হলো বাল্য-বিবাহ। এই সম্পর্কে তথ্য যা পাওয়া যায় তা হলো "ধর্মসূত্রে, স্মৃতিতে ও মহাভারতে বাল্য-বিবাহের বিধি থাকিলেও ইহার ব্যতিক্রমের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মহাভারতে কোন বালিকার বিবাহের উল্লেখ নাই। যে সকল মহিলার উল্লেখ আছে তাহারা প্রত্যেকেই পূর্ণযুবতী অবস্থায় বিবাহ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে যে একাধিক স্বয়ংবরের কাহিনি আছে তাহাও বাল্য-বিবাহের বিরোধী।"[৪২]

যে ভারতবর্ষ নারীর বৈদিক জ্ঞান অর্জনকে স্বীকৃতি দিয়েছে স্বয়ংবরকে সমর্থন করেছে এমনকি সমাজে নারীর প্রাধান্যকেও মেনে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি সেই সমাজে কবে থেকে নারীর এই অবমাননা শুরু হল বলা কঠিন, তবে এর পিছনে যে একাধিক কারণ বর্তমান ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাঙলার সমাজে রীতি-নিয়ম প্রচলন এবং প্রচলিত রাখতে যে শাস্ত্র গ্রন্থগুলির সাহায্য নেওয়া হত তার মধ্যে অন্যতম ছিল বঙ্গীয় স্মৃতিশাস্ত্র। প্রাচীন যুগে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ইত্যাদি স্মার্ত পন্ডিতরা সমাজকে সুশৃঙ্খল ভাবে চালিত করার জন্য বিধিনিষেধ সংক্রান্ত পুস্তক রচনা করেছিলেন। মধ্যযুগে সেই সমাজের অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে। বাংলার ধর্ম ও সমাজ মধ্যযুগে কি আদর্শে পরিচালিত হবে সেই সংক্রান্ত বিধি নিষেধ সম্বলিত পুঁথি রচনা করলেন শূলপানি, রঘুনন্দন, শ্রীনাথ ইত্যাদি পন্ডিতরা। তারা মধ্যযুগীয় নতুন প্রথার সঙ্গে প্রাচীন শাস্ত্রের সঙ্গতি রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। তৎকালীন সমাজে শূলপানি, রঘুনন্দন ইত্যাদি পন্ডিতদের মতামত অলঙ্ঘণীয় আদর্শ ছিল।

সে যুগের প্রধান স্মার্ত পন্ডিত রঘুনন্দন ষোড়শ শতাব্দীর লোক। তিনি তাঁর উদ্বাহতত্ত্বে লিখেছেন "কন্যার রজোদর্শন হইবার পূর্বেই কন্যাদান প্রশস্ত। ৮ বৎসরের কন্যাকে গৌরী বলে, ৯ বৎসরের কন্যা রোহিনী, ১০ বৎসরের কন্যা ইহার পর রজস্বলা হয়। অতএব দশ বৎসরের মধ্যে যত্ন সহকারে কন্যাকে প্রদান করা কর্ত্তব্য। যে কন্যা ১২ বৎসব বয়স পর্যন্ত অপ্রদত্তা হইয়া পিতৃগৃহে বাস করে তাহার পিতা ব্রহ্মহত্যা পাপের ভাগী হয়; এরূপ স্থলে ঐ কন্যার স্বয়ংবর অন্বেষণ করিয়া বিবাহ করা উচিত।"[৪৩]

কোন কন্যা যদি বিবাহের পূর্বেই পিতৃহীন হন, তা হলে তাকে বিবাহ দেওয়ার দায়িত্ব তার ভ্রাতার। এইরকম ক্ষেত্রে প্রাচীন স্মৃতি শাস্ত্র অনুসারে ভ্রাতা বা ভ্রাতৃগণ 'তুরীয়ক' অংশ দান

করে বিবাহের ব্যয়ভার বহন করবেন। 'তুরীয়ক' শব্দের অর্থ কন্যা পুত্র হলে পৈত্রিক সম্পত্তির যে অংশ লাভ করতেন তার চতুর্থাংশ। এর থেকে বোঝা যায় স্মার্ত-সাহিত্য পৈত্রিক সম্পত্তিতে কন্যার কোন প্রকার অংশলাভের কথা উল্লেখ করেন নি।

কন্যা নিদির্ষ্ট সময়ের মধ্যে গোত্রান্তরিত না হলে স্মার্ত সাহিত্য ভ্রাতৃমতী কন্যাকে বিবাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর অর্থ - কন্যা ভ্রাতৃমতী হলে তার পুত্রিকাপুত্রী হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। পুত্রিকাপুত্র শব্দটির অর্থ দ্বিবিধ, একটি অর্থে যে পুত্রিকা সেই পুত্র ; অর্থাৎ পুত্রহীন ব্যক্তি কন্যাকেই নিজের পুত্ররূপে মনোনীত করতে পারেন। অন্য অর্থে তিনি সঙ্কল্প করতে পারেন যে, কন্যার গর্ভে যে সন্তান জন্মাবে সেই তার পুত্র স্বরূপ হবে।

প্রাচীন স্মৃতির অনুসরণক্রমে বঙ্গীয় স্মার্ত পন্ডিতেরা 'পৌণর্ভবা কন্যাকে' বিবাহের বর্জনীয়া বলে ব্যবস্থা করেছেন। নিম্নলিখিত সাত প্রকার কন্যা পৌণর্ভবা বলে অভিহিত। ১) বাগ্‌দত্তা, ২) মনোদত্তা, ৩) কৃতকৌতুকমঙ্গলা, ৪) উদকস্পর্শিতা, ৫) পানিগৃহীতা, ৬) অগ্নিপরিগতা, ৭) পুণর্ভূপ্রভবা। এই বিধান থেকে দেখা যায়, বিধবা তো নয়ই, একজনের উদ্দেশ্যে বাগ্‌দত্তা কন্যাও অপরপক্ষে বিবাহের অযোগ্য। এইসব বিধিনিষেধের আওতায় মেয়েদের ফেলা হত অত্যন্ত অল্পবয়সে। কখনও কখনও তা জন্মলগ্ন থেকেই। আর এর ফলে এইসব বাগ্‌দত্তা কন্যারা পরবর্ত্তীতে সারা জীবন অনূঢ়াও থেকে যেত।

"অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যে রঘুনন্দনের বিধি অনুসারে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে, অবশ্য রঘুনন্দন প্রাচীন শাস্ত্রকারদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই বিধি দিয়েছিলেন। কিন্তু মধ্যযুগের অল্প সংস্কার এই মতটিকে ধর্মের অঙ্গরূপে গণ্য করিয়া বিনা বিচারে ইহা পালন করিত এবং গৌরীদান করিয়া ঐ কন্যার গর্ভজাত সন্তানের পিতৃকুলে একুশ পুরুষ এবং মাতৃকুলে ছয় পুরুষের অক্ষয় স্বর্গলাভের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিত।"[৪৪]

বাল্য বিবাহের প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যে। ব্রাহ্মণদের কুলপঞ্জিকাগুলিতেও এর উদাহরণ আছে। "এই সংক্রান্ত একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য এইরকম ঃ মাত্র তেরদিনের কন্যাকে বিয়ে করে ফুলিয়া মেলের বিখ্যাত কুলীন বিষ্ণু ঠাকুরের পৌত্র সীতারাম আশ্চর্য এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। কারিকায় লিখিত আছে –

সমানে সমানে কুল ধরাধরি তায়।
লোকে বলে সীতারাম তিনশ টাকা পায়।।
দিবসে আঁধার হল পথ বেরাল চেয়ে।
সীতারাম বিহা করেন তের দিনের মেয়ে।।[৪৫]

"মেয়েদের বিবাহ সাধারণত আট বছর বয়সেই হয়ে যেত। এইরকম বিবাহকে গৌরীদান বলা হোত। গৌরীদানই প্রশস্ত বিবাহ ছিল। অনূঢ়া মেয়ের বয়স দশ পেরিয়ে গেলে সমাজে তার পরিজনকে একঘরে হয়ে থাকতে হোত। একঘরে হয়ে থাকা তখনকার দিনে খুব বড় রকমের শাস্তি ছিল। তাদের ধোপা, নাপিত ও পুরোহিত বন্ধ হয়ে যেত। তাদের সঙ্গে কেউ সামাজিক আদানপ্রদান করত না। কোনও সমাজিক কাজেও তারা নিমন্ত্রিত হত না।"[৪৬]

এই "গৌরীদান ও বাল্যবিবাহ নবাগত কনোজিয়া ব্রাহ্মণদের প্রবর্তিত। ব্রাহ্মণেরা অনাদায়কে শ্লোক রচনা করে প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দিতে পারতেন ও দিতেন। সুতরাং মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণকে তাঁদের মতের সমার্থরূপে দাঁড় করাতে বিশেষ কোন চেষ্টা করতে হোত না।"[৪৭]

এর কারণ হিসেবে দীনেশ চন্দ্র সেন উল্লেখ করেছেন পারিপার্শ্বিকতাকে - "হিন্দুর বাইরে গিয়ে বাণিজ্যাদি করার সুবিধা চলে গেল। তাঁদের কর্মক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে এল। গৃহে বাস করে জীবন কাটানোই মুখ্য উদ্দেশ্য হল, তখন গৃহে শান্তি রক্ষা করাই হল তাদের চিন্তার বিষয়। ফলে সমাজের পন্ডিতদের বেঁধে দেওয়া নিয়মের বাইরে তাঁরা যেতে সাহস পেলেন না।[৪৮]

এছাড়া "প্রত্যেক বাড়িই দশজনের ঘর, তাঁরা সকলেই এক প্রকৃতির লোক নয়, প্রাপ্তবয়স্কা রমণী স্বাভাবিক নিয়মে স্বামীর সঙ্গে মিশে যেতে পারেন, কিন্তু স্বামীর গৃহের অপরাপর লোকের সঙ্গে তাঁর অনেক সময় বনিবনা না হওয়াই বেশী সম্ভব। এজন্য গৌরীদানের ব্যবস্থা হল।"[৪৯]

বংশের কৌলিন্য রক্ষা করা অথবা অর্থলোলুপতাই নয়, বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলনের আরও একটি প্রধান কারণ ছিল বর্গী এবং মগ ফিরিঙ্গিদের হাত থেকে কন্যা সন্তানকে রক্ষা করা। মুহম্মদ আবদুল জলিল-এর মতে - "সোনার বাংলা, ভারতের ভূস্বর্গ, জিন্নাতুল বিলাল, রজত পান্নার দেশ এবং রাজোচিত উদ্যান নামে পরিচিত এই ভূখন্ডের বৃহত্তর উপকূলীয় অঞ্চল যাদের অনাচার-অত্যাচার, নিপীড়ন-নির্যাতন ও ধর্ষণ-লুন্ঠনের তান্ডব লীলায় শস্য-শ্যামল প্রকৃতি শ্মশানে এবং জন-কোলাহলপূর্ণ গ্রাম-নগর-বন্দর অরণ্যে পরিণত হয়েছিল বাংলার সেই মূর্তিমান অভিশাপ হল মগ ফিরিঙ্গি। অদ্যবধি তাদের নির্মম-নিষ্ঠুর ও বিভীষিকাময় অত্যাচারের প্রকৃতি তুলনাহীন, ইতিহাস-বিরল।"[৫০]

দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য প্রবাসী পত্রিকায় মগ অত্যাচারিত অনেক পরিবারের করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। কোন কোন কুলপঞ্জিতে দেখা যায়, একই পরিবারের থেকে পাঁচ ভাই এবং তিন বোনকে মগেরা অপহরণ করে নিয়েছে। নদীয়া, যশোহর, হুগলী, বিক্রমপুর, মাটিয়ারী ও শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের আরো অনেক পরিবারের স্ত্রী, কন্যা ও পুরুষ অপহরণের কথা কুলপঞ্জীগুলোতে স্থান পেয়েছে।... বাংলার অপহৃত হতভাগ্য এইসব নরনারী মেদিনীপুরের সমুদ্র তীরস্থ পিপলি বন্দরে বিক্রি করা হতো।"[৫১]

বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে এই মগ ফিরিঙ্গিদের উল্লেখ আছে -

মগ ফিরিঙ্গি যত বন্দুকে করিতে হত
একেবারে দশ বিনা ফুটে।
কামান বন্দুক ভরি ছাড়িতেছে ঘড়ি ঘড়ি,
যার শব্দে হস্তী ঘোড়া ছোটে।।

মগের অধীনস্থ দেশে শাসন ও শৃঙ্খলা ছিল না, মগের পর আসে ফিরিঙ্গিরা। তারাও জলপথে স্বাধীন ছিল। নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালাত। যে সব স্ত্রীলোক এইসব মগ বা ফিরিঙ্গিদের কিছুমাত্র ছোঁয়াচ পেত তারা আর সমাজের মূল স্রোতে ফিরতে পারত না।

কিন্তু বাঙালি জাতীয় জীবনের এই দুঃস্বপ্নকেও হার মানায় আরেকটি অত্যাচার কাহিনি, ইতিহাসে যা বর্গীর নামে পরিচিত। উড়িষ্যা, মেদিনীপুর, বর্ধমান, রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায়ই বর্গীরা অতর্কিতে আক্রমণ চালাত, ধনদৌলত, টাকা-পয়সা ও শস্যাদি ছাড়া তাদের লোভ ছিল নারীদের উপর। অল্পবয়সী থেকে যুবতী কন্যা কেউই তাদের লোভার্ত দৃষ্টি থেকে বাদ পড়ত না। এদের উপর চলত তাদের পাশবিক অত্যাচার, পরে এদের বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করে দিত। গঙ্গারাম তার মহারাষ্ট্র পুরাণে উল্লেখ করেছেন -

ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ।
আঙ্গুষ্ঠে ধরি বাধি দেয় তার গলা এ।।
একজনা ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।

রমনের ডরে ত্রাহি শব্দ করে।।
এই মতে বর্গী যত পাপ কর্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রী লোকে যত দেয় সব ছাইড়া।।

সাত আটজন বর্গী মিলেও যে একজন স্ত্রীলোকের ধর্মনাশ করতো এ ঘটনাও অবিশ্বাস করা যায় না। বর্গীর হাত থেকে পরিবারস্থ মেয়েদের রক্ষা করার জন্যও বাড়ীতে অনূঢ়া কন্যা রাখা হোত না, মাথায় সিঁদুর দেওয়ার প্রচলনও সেই সময় থেকে বলে মনে করা হয়।

এছাড়া বাড়িতে অনূঢ়া কন্যা রাখা খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার বলেও মনে করা হোত। সোজা ভাষায় অতীতের একটা বিরাট সময় কন্যা সন্তানকে পরিবারের গলগ্রহ বলেই মনে করা হোত। সব মিলিয়ে বাঙলাদেশের সমাজে অনেকদিন পর্যন্ত বাল্যবিবাহ অতি প্রচলিত একটি রীতি হিসাবেই মান্যতা পেয়ে এসেছে। বাঙলাদেশের ছড়াতে তার প্রতিফলন -

১। দোল দোল দুলুনি
রাঙা মাথায় চিরুনি,
বর আসবে এখুনি
নিয়ে যাবে তখুনি।

(রাঙা মাথা অর্থাৎ সেইসব শিশুদের মাথা, যা এখনও পরিণত হয়নি, দোলনায় ঘুমন্ত শিশুকে সেই মাথায় চিরুনি চালিয়ে বিয়ের উপযুক্ত সাজে তৈরী করে দেওয়া)

২। বাপ যায় রে নায়ে নায়ে, খুড়া যায় রে তড়ে,
শিশুকালে দিল বিয়া, সদাই আগুন জ্বলে।।
খুড়ী কান্দে, জেঠী কান্দে, সকল কান্দে পর।
মা জননী কান্দে বেলা আড়াই প'র।।
খুড়ী লো, জেঠী লো - মাকে নে যা ঘরে।
মায়ের কান্দনে আমার ডুলি পাক পাড়ে।।[৫২] (ফরিদপুর)

৩। ঢাক ঢোল বাজে রে।
পশ্চিম পাড়ারা নাচে রে।।
ঢাকের মধ্যে তেলের বাটি, মালসা পুরা দই।
সান পুকোরি খেয়ে আমি মনের কথা কই।।
মতনর মেয়ে পান বাটে, তাতে পল বালি।
শিশু মেয়ে বিয়ে দিয়ে মন হল কালি।।[৫৩] (যশোহর)

৪। বেতের বান্ধন বেতের ছান্দন।
তার মধ্যে বস্যা বিবি জুড়িল কান্দন।।
আর কাইন্দ না বেলা উদয় শেষ।
গাও তোল ডুলিত চড়, চল আপন দেশ।।
কন্দুর ঘাটা যায়া বিবি ফিরিয়া যায়।
বাপের ভাইয়ের দালান কোঠার ঝিলিক দেখা যায়।।
থাক থাক দালান কোঠা মায়ের আত্মা জুইড়া।
যদি বিবি বাইচা থাকে আবার আইসব ফির‍্যা।।[৫৪] (পাবনা)

৫। উলু উলু শিমূলের ফুল , মুকুট মাথায় দিয়া।
শিমূল ফুল তুলতে গেলাম, তাইতে হল বিয়া।।
আয় লো খেলার সই, খেলার সাজ নিয়া।
আর ত খেলব না খেলা পরের দেশে গিয়া।।
ঢোল বাজে ঘুমুর ঘুমুর, সানাই বাজে রয়া।
পরের ছেলে নিতে এল ঢোলে টোকর দিয়া।।
আম-কাঁঠালের পিঁড়িখানা ঘি মউ মউ করে।
তারি উপর বাপ ভাই কন্যা দান করে।। [৫৫](ফরিদপুর)

৬। ওপারে ধনচে গাছ রামছাগলে খায়।
তার তলায় দিয়ে খুকুরাণী বিয়ে হয়ে যা।।
আগে যায় বর মহাশয় চার ঘোড়ায় গাড়ি।
তার পিছনে খুকুরাণী চৌ দোলাতে চড়ি।।
তার পিছনে কাকাবাবু যান দৌড়াদৌড়ি।
তার পিছনে মামাবাবু হাতে সোনার ছড়ি।।
তার পিছনে ঝিয়েদের মাথায় রকম রকম হাড়ি।
তার পরেতে সবশেষে শ্বশুর ঘর গেল।
সহিত শুভক্ষণ করে দুধে-আলতা হল।।
সবাই দেখে বললে, ওগো বউ হয়েছে কালো।
শাশুরি ননদ বললে, আমার ঘর করেছে আলো।
নুড়ো নুড়ো খড়ের আগুন শত্রু মুখে জ্বালো।। [৫৬] (পাবনা)

৭। অনুপমা দুধের সর।
চায় না যেতে পরের ঘর।।
বাপ বলছে আয় আয়।
মা বলছে থাক।।
বৌ বলছে দূর করে দাও।
বাপের বাড়ি যাক।।[৫৭]

বাঙলার একটা দীর্ঘ সময়ের এই সমাজচিত্র যা সমাজস্থিত ক্ষমতাসীন কিছু মানুষের অধিকার ও সুবিধার কারণে তৈরী হয়েছিল ও সযত্নে রক্ষিত হয়েছিল তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। পরবর্ত্তীতে রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর ইত্যাদি আরও কয়েকজন মানুষের আন্তরিক চেষ্টায় নারীত্বের পক্ষে অপমানজনক এইসব নিয়মকানুনের কিছু কিছু আইনের চোখে অবৈধ বলে ঘোষিত হলেও সমাজের সার্বিক স্তরে মান্যতা পেতে সময় লাগল অনেক। এমনকি আজ পর্যন্ত সমস্ত নারীসমাজ এই সংস্কারমুক্ত এমনটি মনে করার কোনো কারণ নেই।

গ্রন্থপঞ্জি :

১। ঘোষ বিনয়, সংস্কৃতির সামাজিক দূরত্ব, পৃঃ ৬০

২। মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৩৩

৩। ভট্টাচার্য স্বপ্না, বঙ্গীয় সমাজে জাতিবর্ণ প্রথা, পৃঃ ১২৫

৪। ভট্টাচার্য স্বপ্না, বঙ্গীয় সমাজে জাতিবর্ণ প্রথা, পৃঃ ১২৯

৫। ভট্টাচার্য নরেন্দ্রনাথ, ভারতীয় জাতি বর্ণ প্রথা, পৃঃ ১৬৬

৬। মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খন্ড, পৃঃ ২১৩

৭। ভট্টাচার্য স্বপ্না, বঙ্গীয় সমাজে জাতিবর্ণ প্রথা, পৃঃ ১৩১

৮। মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ২৩৪

৯। মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ২১৮

১০। রায় যোগেশ চন্দ্র, বর-পণ ও বিবাহ, (বঙ্গ দর্শন - ১৩১৬) পৃঃ - ৪০৮

১১। মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, পৃঃ ৩৪৭

১২। সুর অতুল, বাংলা ও বাঙালীর বির্বতন, পৃঃ ১৯৭

১৩। সুর অতুল, আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী, পৃঃ ৮৪

১৪। আহমেদ্ ওয়াকিল, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পৃঃ ১৪৯

১৫। আচার্য নন্দ দুলাল, রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি, পৃঃ ১৫৬

১৬। মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাঙলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ৩৪৭

১৭। মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাঙলাদেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, পৃঃ ৩৪৯

১৮। হক সৈয়দ আজিমুল, আমি নারী, মালেকা বেগম,পৃঃ ৯

১৯। লাহিড়ী শিবচন্দ্র, যশোর-খুলনার ছড়া পৃঃ ২৩৪

২০। ভট্টাচার্য আশুতোষ, লোকসাহিত্য, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৯

২১। মজুমদার তুলিকা, বাংলার লোক সংস্কৃতি ও গ্রামীণ নারী, পৃঃ ২৭

২২। লাহিড়ী শিবচন্দ্র, যশোর-খুলনার ছড়া, পৃঃ ১৩৮

২৩। ঘোষ বিনয়, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, চতুর্থ খন্ড, পৃঃ ১৭০

২৪। মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাঙলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৪৯

২৫। মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাঙলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ৩০০

২৬। মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাঙলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ ৩০০

২৭। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাঙলার লোকসাহিত্য, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৫১

২৮। বাংলা একাডেমি অভিধান (লাছ দুয়ার - ধানের বিচালির পাঁজা) পৃঃ ৯০৩

২৯। চট্টোপাধ্যায় শিবপ্রসাদ, ছড়া - লোকায়ত পশ্চিম রাঢ়, পৃঃ ১৪২

৩০। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন, ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা (১৭৫১-১৮৫৫) পৃঃ ৮৬

৩১। বন্দ্যোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন, বাংলার ইতিহাস নবাবী আমল, পৃঃ ৪১৯
৩২। বন্দ্যোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন, বাংলার ইতিহাস নবাবী আমল, পৃঃ - ৪২০
৩৩। রবীন্দ্র সংগ্রহ, লোকসাহিত্য, পৃঃ - ৭৬
৩৪। ছোটদের ছড়া সঞ্চয়ন শিশু সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৪
৩৫। আহমেদ ওয়াকিল, বাঙলার লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পৃঃ ৩
৩৬। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাঙলার লোকসাহিত্য, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৫৯
৩৭। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাঙলার লোকসাহিত্য, ১ম খন্ড,পৃঃ ১৮৫-৮৬
৩৮। লাহিড়ী শিবচন্দ্র, যশোর-খুলনার ছড়া, পৃঃ ২৬১
৩৯। চট্টোপাধ্যায় শিবপ্রসাদ, লোকায়ত পশ্চিম রাঢ়, পৃঃ ১৩৯-৪০
৪০। আঞ্চলিক অভিধান, লিত - রোজ, পৃঃ - ৯০৯
৪১। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩০৫
৪২। মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাঙলাদেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, পৃঃ - ৩৪৫
৪৩। মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, পৃঃ ৩৪৬
৪৪। মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, পৃঃ ৩৪৬
৪৫। নস্কর সনৎ কুমার, মুঘল যুগের বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ২০২
৪৬। সুর অতুল, বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন, পৃঃ ১৯৭
৪৭। সেন দীনেশচন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৯৬
৪৮। সেন দীনেশচন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ৫৯৬
৪৯। সেন দীনেশচন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গ, পৃঃ ৫৯৬
৫০। জলিল মহম্মদ আবদুল, বঙ্গে মগ-ফিরিঙ্গি ও বর্গীর অত্যাচার, পৃঃ ২৩
৫১। ভট্টাচার্য দীনেশ, বাঙলায় মগ দৌরাত্ম্যের বিবরণ, পৃঃ - ৬০৭
৫২। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাঙলার লোকসাহিত্য, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৫৮
৫৩। লাহিড়ী শিবচন্দ্র, যশোর-খুলনার ছড়া, পৃঃ ১৬২
৫৪। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাঙলার লোকসাহিত্য, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৬৩
৫৫। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাঙলার লোকসাহিত্য, পৃঃ ৩৪৪-৪৫
৫৬। ভট্টাচার্য আশুতোষ, বাঙলার লোকসাহিত্য, পৃঃ ৩৩৮
৫৭। আহমেদ ওয়াকিল, বাঙলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পৃঃ ১৪৯